-:: লোক সাহিত্য ::-

‡ সঙ্গীত ‡

— ভাওয়াইয়া —

ভাওয়াইয়া গান সাধারণত: লোকমানসের সৃষ্টি। লোকসঙ্গীত বলেই ভাওয়াইয়া গানে লোকজীবননিষ্ঠ কিছু অভিনব প্রকাশভঙ্গী রয়েছে। এ গান শুধু মাত্র পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলেরই নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের এক মূল্যবান সম্পদ। আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী জেলা এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলা পর্যন্ত ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সুখদুঃখ, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ অনুভূতিকে তুলে ধরা ভাওয়াইয়া গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাওয়াইয়া গানের মধ্য দিয়ে কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে এক বিশেষ অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু লৌকিক সুখদুঃখের ঊর্ধ্বচারী প্রেমভাবনা নয়। মর্তমানবমানবীয় জীবনে বিশেষ সময়ে যে প্রেমের সঞ্চার হয়, তাকেই কথা ও সুর সহযোগে ভাওয়াইয়া গানে অমর করে রাখা হয়। উক্ত সঙ্গীতে বাস্তব ঘেঁষা প্রেমের কথাই বার বার ধ্বনিত হয়েছে। বিরহকাতরা নারী হৃদয়ের সমবেদনা প্রকাশে, অশ্রুসিক্তা প্রেমিকার নিখুঁত চিত্র রচনায় অধিকাংশ ভাওয়াইয়া গান অপূর্ব শিল্পশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিরহের সুরই ভাওয়াইয়া গানের Keynote বা মূল সুর। ভৌগোলিক পরিবেশ যেখানে শান্ত ও উদাস সেখানে প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চিত্রাঙ্কণ করা ভাওয়াইয়া গীতিকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই প্রেমের বিরহবিধুর রূপটি ভাওয়াইয়া গানে অতি স্পষ্ট। প্রবাসী প্রেমাস্পদের জন্য যে সঙ্গীহীনা প্রেমিকা আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, প্রেম নিবেদনের অনেক আগেই সেই নারী তার প্রিয়তমকে হৃদয়মন্দিরসমর্পণ করেছিল। ভাওয়াইয়া গানে এই প্রেমাস্পদের পৌনঃপুনিক আগমন ঘটে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন নামে। যেমন মহিষাল বন্ধু, মাহুয়া, কালা, আমোয়াল, নাইয়া, ভোমরা, গাড়িয়াল ইত্যাদি।

ভাওয়াইয়া গানে নারীর অশ্রু মোচনের কারণ বিচ্ছেদ ভাবনা নয় — ক্ষণস্থায়ী মিলনের পর দীর্ঘস্থায়ী বিরহের বেদনা প্রসূত। বিরহের করুণ ক্রন্দন শুরু হয় প্রিয়-মিলনের সুমধুর সুরের অব্যবহিত পরেই। তাই মিলনকে স্বীকার করেই বিরহ বিধুরা

নারীর চিত্র অঙ্কিত হয় ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে। বিরহের সুর যদিও এখানে প্রবল, তবুও পূর্ব মিলন জনিত আনন্দস্মৃতির সঙ্গে তা একেবারে সম্পর্ক শূন্য নয়। প্রকৃত পক্ষে ভাওয়াইয়া গানে প্রেমিক প্রেমিকার মিলন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সেই তুলনায় বিচ্ছেদ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। তাই মিলন জনিত স্মৃতির যে রেশটুকু অবশিষ্ট থাকে, দীর্ঘ বিরহ বেদনার সাথে তা যুক্ত হয়ে প্রেমিকাকে প্রায়োন্মাদিনী করে তোলে। সুতরাং যদিও ভাওয়াইয়া গান বিরহের গান, তবুও বিরহের দীর্ঘ কালসীমার সাথে স্বল্প মিলনক্ষণের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে প্রেমিকা তার দয়িতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের আর এক নাম 'দোতরার' গান। 'দোতরা' নামক যন্ত্রসহযোগে গীত হয় বলেই এ গানের নাম দোতরার গান। কিন্তু দোতরাই ভাওয়াইয়া গানের একমাত্র সহযোগী বাদ্যযন্ত্র নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আড় বাঁশী, জুড়ি বা করতাল এবং বর্তমানে তবলা ও হারমোনিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়েছে। গোয়ালপাড়া ও রংপুর জেলায় টেম্‌কি বা টুঙ্কি নামক চর্মাচ্ছাদিত ক্ষুদ্রাকৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং খোল ও ব্যবহৃত হয়। টুঙ্কি সাধারণতঃ বাউদিয়া বা বাউরিয়া সম্প্রদায়ের হাতে দেখা যায়। + সাম্প্রতিক কালে টুঙ্কির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।

ভাওয়াইয়া গীতি রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতা বা কথাকারের কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা নেই। সময়ে-অসময়ে, প্রয়োজনে – অপ্রয়োজনে যে ভাব মনের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়, তাকেই কথা ও সুরের মধ্যে তুলে ধরেছেন স্বল্প শিক্ষিত গীতিকারেরা। ভাওয়াইয়া গানের ভাষা তাই সর্বত্র শুদ্ধ বা ব্যাকরণ দোষমুক্ত হতে পারে নি।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে যে' ভাবমূলক ও 'একক' আঞ্চলিক সঙ্গীতে + নারীমনের একটি মাত্র বিষয়কে অবলম্বন 'করে রচিত হয় এবং' বিরহ বা বিচ্ছেদের অংশ যার একমাত্র উপজীব্য, তাই ভাওয়াইয়া সঙ্গীত নামে পরিচিত।'[১]

সুশীল কুমার ভট্টাচার্য বলেন, 'মূলতঃ বাওয়াইয়া কথাটির অর্থ 'ছন্নছাড়া'। এই বাওয়াইয়া (ছন্নছাড়া) সম্প্রদায় কর্তৃক যে গান গীত হয় তাকেই ভাওয়াইয়া গান বলে।'[২]

প্রবন্ধকার মানিক সরকারের মতে' কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলে নিধুয়া পাথারকে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে' ভাওয়া' বলা হত। ভাওয়াতে সমাজের শ্রমজীবী দরিদ্র নরনারীরা কাজ করতেন। .... গান বাঁধতেন। সে গানে তাদের দুখী জীবনের বেদনাই প্রাধান্য পেত। ভাওয়াতে এ গান সৃষ্টি হত বলেই পরবর্তী কালে ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত হয়।'[৩]

গজেন্দ্র চন্দ্র সরকার বলেন, 'ভাব + ইয়া' প্রত্যয় যোগে ভাবিয়া – তার থেকে হয়েছে 'ভাওয়াইয়া।'[৪]

আমাদের মনে হয়, ভাওয়াইয়া নামকরণের পেছনে 'ভাউলিয়া' শব্দটিরও প্রভাব আছে। 'ভাউলিয়া' এক ধরণের ছোট ডিঙ্গি নৌকা। এই নৌকোয় চড়ে নিশুতিরাতে প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের আশায় নদীপথে পলায়ন করে। 'ভাওয়াইয়া' শব্দের একটি অর্থ অভিসার। বাগদত্তা যুবতীর 'ভাওয়াইয়া' বা অভিসারকে কেন্দ্র করেই ভাওয়াইয়া গানের জন্ম হওয়া অসম্ভব নয়।

সুরের বিচারে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। দরিয়া ও চট্‌কা। দরিয়া শ্রেণীর ভাওয়াইয়াতে প্লুত স্বরের প্রাধান্য থাকায় গানের সুরকে কিছুক্ষণ টেনে রাখা যায়। এর ফলেই বিশেষ বিশেষ শব্দের মাঝে 'হ' এর আগম হয় এবং সুরের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। যেমন আসিবেন > আহাসিবেন, মোর > মোহোর, মন > মহন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বা উচ্চারণ ভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে সুর-আশ্রিত।

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলি শব্দ আছে যেগুলিকে গায়ক ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিকৃত করেছেন। এই বিকৃতির ফলে শব্দের মাধুর্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, যাইবার । এক্ষেত্রে 'য' এর উচ্চারণ ইংরাজী 'Z'-এর মত।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিভিন্ন প্রহরের জন্য যেমন বিভিন্ন রাগরাগিণীর আলাপ নির্দিষ্ট হয়েছে, ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও গায়ককে অনুরূপ নির্দেশমেনে চলতে হয়। সন্ধ্যা সমাগমে দরিয়া বা ভাঙ্গা দরিয়া, নিশুতি রাতে উজানী, ব্রাহ্ম মুহূর্তে হেঁয়ালি শ্রেণীর ভাওয়াইয়া গীত হয়। এগুলির প্রত্যেকটি ধীর লয়ের গান। কোনো কোনোটিতেই সুর লঘু চটুল নয়। চট্‌কা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে চট্‌কা, চলন্তিকা, ঝুমটা ও ফিরন। চট্‌কা প্রাণোচ্ছল হাসি ও রঙ্গরসের কথায় ভরপুর। চলন্তিকা চলতে চলতে গাওয়া হয়। চলার গতিবেগের সঙ্গে সুর ও ভাবের গতিবেগ নির্দিষ্ট হয়। ঝুমটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছয়মাত্রা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ছয় মাত্রাকে ৩ + ৩ = ৬ এই মোট দুটি অংশে বিভক্ত করে গাওয়া হয়। মানবজীবনের খণ্ডচিত্রগুলিই ঝুমটাতে প্রাধান্য পায়। ফিরন শুধুমাত্র একটি লয়ের মধ্যে আবর্তন করে না। ঝুমটা, চলন্তিকা প্রভৃতির লয়ের সঙ্গে ফিরনের পার্থক্য এই খানেই। কখনও দ্রুত, কখনও মধ্য আবার কখনও বা ঢিমা লয়ে ফিরন গীত বা পরিবেশিত হয়। ফিরন সন্ধ্যাকালীন গীত।

"ভাওয়াইয়া গানে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মুদারা গ্রামের কোমল নিখাদ পর্যন্ত সুরের ব্যবহার দেখা যায়। তবে কখনও তারা সপ্তকের 'সা' ব্যবহৃত হয় না। কোনো

কোনো গানে ক্ষেত্রবিশেষে দু'একটি উদারা গ্রামের সুর ব্যবহার করা হয়। পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) লোকগীতিতে যেমন উদারা, মুদারা ও তারা সুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে দেখা যায়, বীরভূমের বাউলের মধ্যেও এটা পাওয়া যায়।'[৫]

একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়। কোনো একটি বিশেষ কাহিনীকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে এ গান রচিত হয় না। তাই ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রে 'গীতিকার' পরিবর্তে 'গীতি' শব্দটিই প্রযুক্ত। ভাবগভীরতা এবং করুন রসসৃষ্টির জন্য অধিকাংশ দরিয়া শ্রেণীর ভাওয়াইয়া গানে 'ওকি', 'আরে', 'ও', 'ওকে', 'ঐ', 'ওহে', 'ঐ যে', 'ঐ না প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই শব্দগুলি সুরমাধুর্য বৃদ্ধির পক্ষে ও একান্ত উপযোগী।

— চট্‌কা —

পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মুখের ভাষায় চট্‌কা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'চট্‌কা শব্দের অর্থ ছিটিয়ে দেওয়া। 'রাজবংশী অভিধান' গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন বর্মণ চট্‌কা বলতে 'ছিটাইয়া দেওয়া' বুঝিয়েছেন। 'আবার' চট্‌কাচট্‌কি' অর্থে ছিটোছিটি বোঝানো হয়। পুকুর, নদী, অথবা জলাশয়ে ক্রীড়ারত শিশু-কিশোরদের জল নিয়ে 'চটকা চট্‌কি' করাকে বলা হয় পানি চট্‌কা। সুতরাং চট্‌কা শব্দটির দ্বারা কোনো একটি বিশেষ ক্রিয়া বা কাজ বোঝানো হয়। সর্বত্রই সে কাজ লঘু বা হালকা ধরণের হয়। হাতের তালুতে জল অথবা শস্যবীজ নিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া কাজটির মধ্যে গুরুভার নেই। ছোটো ছেলে মেয়েদের জল নিয়ে 'চট্‌কাচট্‌কির' মধ্যেও তাদের মধ্যে লঘু খেয়ালী মনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চট্‌কা শব্দের আরও একটি অর্থ আছে। তা হল' অবহেলে সরিয়ে দেওয়া'।[৬] এখানেও ক্রিয়াসম্পাদকের পক্ষে কৃত কর্মটি লঘু বা হালকা ধরণের।

উপরোক্ত চট্‌কা শব্দটি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক ধরণের বিশেষ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন, ' ভাওয়াইয়া গানেরই

একটি অধঃপতিত রূপের নাম চটকা ।' (পৃষ্ঠা : ২৮১) আমরাও এ বিষয়ে একমত। তবে একমাত্র ভাষা ছাড়া ~~ভাব~~, তাল, লয়, বিষয় সব দিক দিয়েই ভাওয়াইয়ার সঙ্গে চটকার দূস্তর ব্যবধান থাকায় চটকাকে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের লঘু প্রকাশ বলতে অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন। তাছাড়া ভাওয়াইয়া গান গীতিরস ও সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। শুধু তাই নয়, প্রেমের ক্ষেত্রে বেদনার অনুভূতি প্রবল ও প্রধান হওয়ায় ভাওয়াইয়া গান প্রথমাবধি' কলুষতামুক্ত ।' পক্ষান্তরে চটকার বিষয় প্রাত্যহিক জীবনের অতি ~~সাধারণ~~ তুচ্ছ অনুল্লেখ্য ঘটনা , গপ্(গল্প) , কিচ্ছা (কিস্সা)।

চটকার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার হাস্যরস । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাস্যরস অত্যন্ত লঘু ধরণের । ভাওয়াইয়া গানে বেদনার অনুভূতি যেখানে প্রবল , চটকায় লজ্জার অনুভূতি সেখানে একক এবং একমাত্র । সুর ও ছন্দের দিক দিয়ে চটকা লঘুচটুল।এদিক দিয়ে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সমতলভূমিতে প্রচলিত রংপাচালেরসঙ্গে চটকার সাদৃশ্য রয়েছে ।

চটকার দোতরা নামক ~~তারের~~ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় । বর্তমান যুগে দর্শকপূর্ণ সঙ্গীতের আসরে চটকার সহযোগী বাদ্যযন্ত্র দোতরার সঙ্গে হারমোনিয়াম,ডুগিতবলা ও করতাল ব্যবহৃত হয়।কোনো কোনো চটকা গানে মূল গায়কের সঙ্গে একাধিক সহশিল্পী বা গায়ক কণ্ঠ মিলিয়ে থাকেন ।

—রং পাঁচাল —

প্রাকৃত রূপ। পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের 'রং পাঁচাল' অবিভক্ত বাংলা দেশের যাত্রা-পালারই ~~শৈশবিক~~ অভিব্যক্তি । একটি বিশেষ অঞ্চলের জনমানসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাঁচালকার ~~তার~~ রংপাঁচালের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন করে থাকেন । যা ' বিশাল ও বৈচিত্র্যে দিগন্ত প্রসারী তাকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয় । শুধু তাই নয়, উপলব্ধি ও আয়ত্তীকরণের জন্য চাই প্রতিভা বা সৃজনীশক্তি । এখানেই মননশীলতার প্রশ্ন, এখানেই আসে সঙ্গতি । কিন্তু কল্পনাশক্তির সঙ্গে সৃজনীশক্তির সর্বদেশের,সর্বকালের একটি মিল রয়েছে । এই গঠনগত ঐক্যের সার্থক ফলশ্রুতি পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রংপাঁচাল ।

উত্তরবাংলায় কবে কোন্ যাত্রাদল লোকমন মাতিয়ে তুলেছিল তার ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে নেই। তবে উনবিংশ শতাব্দীতেই যাত্রাপালা উত্তরবঙ্গের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছিল বলে অনুমিত হয়। কুচবিহারের মহারাজাদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত ও অভিনয়কে মর্যাদার চোখে দেখতেন। তাছাড়া কুচবিহার রাজবংশের বিদ্যোৎসাহিতা ও সংস্কৃতি চর্চাও অতি প্রাচীন। মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের পত্নী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেব্যা, মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের পত্নী নিরুপমা দেবী, মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ, মহারাজ নরনারায়ণ— এঁরা প্রত্যেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৃহৎ বঙ্গসংস্কৃতির অন্তর্গত যাত্রাপালা তার জন্মলগ্নের কিছু পরেই কুচবিহার রাজন্যবর্গ, সভাসদ ও অনুগত প্রজাবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছিল— এরকম জনশ্রুতি একেবারে অমূলক নয়। বর্তমান কালের রংপাঁচাল সেই যাত্রাপালারই আঞ্চলিক রূপ। যাত্রা ও রংপাঁচালের সঙ্গে যেন পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। পিতার সঙ্গে দেহমনে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু পিতৃপ্রতিভার পূর্ণ অধিকার থেকে অনেকটা বঞ্চিত।

'রংপাঁচাল' শব্দটি আসলে 'রঙ্গপাঁচালীর' বিকৃত রূপ। সব দেশে সব কালেই কথ্য ভাষা অর্থাৎ জনগণের মুখের ভাষা পরিবর্তনশীল। শ্বাসাঘাত ও স্বরাঘাত এই পরিবর্তনের দু'টি মুখ্য কারণ। বিশুদ্ধ আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েও আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর উচ্চারণ বিকৃতির ফলে যে ভাবে নিরিক্ষণ > নিরিখন, গোত্র > গোত, প্রত্যয়ন > পৈতান-এ রূপান্তরিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে 'রঙ্গপাঁচালী' > 'রংপাঁচাল'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের মুখের ভাষা যেন চলমান নদীর স্রোত। স্থির বা নিশ্চল অবস্থায় থাকতে পারে না বলেই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্রোতোধারার মতই কথ্য ভাষা এক একটি মোড় নেয়। 'রঙ্গপাঁচালী' শব্দটি কোনো এক সময় প্রচলিত ছিল, অধুনা শিথিল উচ্চারণের ফলে তা 'রং' বা 'রঙ'-এ পর্যবসিত হয়েছে।

'পাঁচালী' শব্দটিও বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। এর একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হল "পা-চালি' বা পদসঞ্চালন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের পাঁচালকার' পদচালনা' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন না। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'সমাজ' গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে লিখেছেন, ' একদিন সন্ধ্যার সময় কামিনীকান্ত বাবু একাকী উদ্যানে পাইচালি করিতেছেন।' দেখা যাচ্ছে, অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়েও শব্দটিকে পরিবর্তন করে 'পাইচালি' করা যায়।

রংপাঁচাল গোটা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত নেই। শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই রংপাঁচালের আসর বসে। মালদহ জেলার আলকাপের সঙ্গে রংপাঁচালের বিভিন্ন সাদৃশ্য রয়েছে। তবুও আলকাপ রংপাঁচাল নয়। কারণ আলকাপের অধিকাংশ প্লটই প্রেমকেন্দ্রিক। এর মিলনাত্মক উপসংহার অভিনয়ের মধ্য পথেই দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আলকাপে একটিমাত্র প্রধান ঘটনা থাকে। অবিমিশ্র হাসির স্রোতে দুঃখের বা বেদনার হালকা খড়কুটোগুলি ভেসে যায়। ~~আলকাপে নৈতিক শিক্ষাদানের~~ কবিতা পাঠ জাতীয় সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাও আলকাপে পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, রংপাঁচালের প্লট বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে পারে। হাস্যরস মুখ্য হলেও করুণ রস থেকে রংপাঁচাল বিচ্যুত নয়। প্রধান কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনীও এতে যুক্ত হয়। রংপাচালে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়ে থাকে। সাহিত্যে বা অন্যান্য শিল্পকলায় এই নৈতিক শিক্ষাদান প্রাচীন ভারতবর্ষ, গ্রীস ও চীন দেশেও প্রচলিত ছিল।

পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলায় রংপাঁচালের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এছাড়া কুচবিহার জেলা ও দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ী এবং খড়িবাড়ী গ্রামের রংপাঁচালের প্রচলন আজও লুপ্ত হয়নি। বাংলাদেশের রংপুর জেলাতেও রংপাঁচালের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে বাংলাদেশই রংপাঁচালের জন্মস্থান। বর্তমানে যাঁরা এতদঞ্চলে রংপাঁচালের ধারক ও বাহক, তাঁদের মতে রংপুর জেলা থেকেই এ গান জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। জলপাই-গুড়ি জেলার মাঝিয়ালী গ্রামের বিখ্যাত পাঁচালকার নাকারু রায়ের অভিমত এই যে রংপুর জেলায় রংপাঁচালের জন্ম হওয়ায় উক্ত জেলার নামানুসারে এই গানের নাম হয়েছে রংপাঁচাল। অর্থাৎ রংপুর জেলার যে পাঁচাল— তা-ই রংপাঁচাল।

রংপাঁচালের শুরুতেও হাসি, সমাপ্তিতেও হাসি। মাঝে মাঝে করুণরসের যোগান দেওয়া হয়। যাত্রাপালা থিয়েটারের কুশীলবের মত এতেও পাত্রপাত্রী থাকে। প্রধান ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন, তাঁর ভূমিকা কখনও প্রধান সেনাপতি অথবা দিগ্বিজয়ী বীর অথবা দেবতার ভূমিকা নয়। যাত্রাপালার নায়কের সঙ্গে রংপাঁচালের নায়কের পার্থক্য এইখানেই। যাত্রাপালায় সাধারণতঃ নায়কের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় খলনায়ক। রংপাঁচালের যিনি প্রধান চরিত্র, তাঁর দায়িত্ব হাস্যরস পরিবেশনের মধ্য দিয়ে লোকচিত্ত বিনোদন করা। ইনিই হলেন 'বত্তেয়া'। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাঁচালকার স্বয়ং বত্তেয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এঁর পাশেই থাকেন অন্যান্য চরিত্র

যাঁদের কাজ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে রংপোচালের রংপাঁচালকে সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়া । রংপাঁচাল কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই এতে পাচালকারের স্বাধীন বক্তব্য প্রকাশিত হয় । এখানেই কল্পনা শক্তির সঙ্গে মননশীলতা যুক্ত হয়।

মেলামাঠে , হাটে -বাজারে , মেলা-বারণী' অথবা গৃহস্থের আঙ্গিনায় রংপাচালের আসর বসে থাকে । কোনো মঞ্চ তৈরী হয় না মাটিতেই ত্রিপল বা সতরঞ্চি বিছিয়ে পাঁচালের আসর শুরু হয় । প্রাচীন ভারতে গুরুর সম্মুখভাগে শিষ্যরা অর্ধবৃত্তাকারে বসে জ্ঞানার্জন করতে করতেন , রংপাঁচালের শ্রোতৃমন্ডলী বৃত্তাকারে আসরের চারপাশে বসে পাঁচালীর রস আস্বাদন করেন ।

বন্দনাগান দিয়ে আসর শুরু হয় । সরস্বতী বন্দনার সঙ্গে চতুর্দিকে বন্দনা এবং দর্শকের কৃপা ও করুণা ভিক্ষা করা হয় । সেই সঙ্গে মূল কাহিনীর সামান্য ইঙ্গিতও বন্দনা অংশে যুক্ত হয় । এর পরেই একাধিক নারীবেশী পুরুষ নর্তক আসরে উপস্থিত হন । কখনও কখনও অবশ্য বন্দনার পূর্বেই নারীবেশী পুরুষের নৃত্য দর্শকমনে পুলকজাগ্রত করে থাকে । পাঁচালকার মনস্তত্ত্বের রূপকার । তাই রংপাঁচালের কাহিনী থেকে তিনি কখনও নারীকে বাদ দেন নি ।

রংপাঁচালে একটি প্রধান কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হয় । ফলে এই কাহিনী অতিলৌকিক বা অলৌকিক হতে বাধা নেই । অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কাহিনী একেবারে বাস্তব ঘেঁসা হয়ে থাকে । বন্যা , স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দুর্যোগ , ব্যর্থপ্রেম , সমাজপতির ব্যাভিচার প্রভৃতি অবলম্বনে রংপাঁচালের কাহিনী রচিত হয় ।

প্রতিটি রংপাঁচালেই সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয় । পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অতি কঠোর । পাঁচাল রচয়িতা নিজেও এই সংগ্রাম মুখর জীবনেরই অংশীদার । কখনও কাঠুরিয়ার মত বনে বনে কাঠ কেটে, কখনও 'গিরি'বা জোতদারের 'পরজা ' হয়ে আধিয়ারী করে কখনও পার্বত্য নদীতে মাছ ধরে , কখনও অনুর্বর চারণভূমিতে গরুমোষ চরিয়ে দারিদ্রের মোকাবিলা করতে হয় । সময়ে সময়ে পুরুষের সঙ্গে মেয়েরাও এসে কাজে যোগ দেন । শ্রাবণের ঘন বর্ষায় ছাতার অপেক্ষায় বসে না থেকে এঁরা একহাঁটু কাদা জলে চাষের কাজ শেষ করার চেষ্টা করেন । বিনা সাইকেলে বা মোটরে ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে যান । সাধার মানুষের এই দুঃখের কথাই রংপাঁচালকার হাস্য রসের ফাঁকে ফাঁকে যোগান দিয়ে থাকেন ।

রং পাঁচালরচয়িতা সর্বরিক্ত বিষাদ ক্লিষ্ট জীবনকেই একমাত্র বলে ধরে নেন নি। তাই দুঃখের পাশাপাশি সুখী জীবনের চিত্রও তাঁরা এঁকেছেন। নয়নজলের বন্যা দেখে ভীত হলে ও তারা সাহসে বুক বেঁধে আশার গান শুনিয়েছেন। এই ইতিবাচক (Positive) দৃষ্টি ভঙ্গির ফলেই রংপাচাল আজ অতীতের তুলনায় বেশী পরিমাণে সমাদর লাভ করেছে।

রংপাচালেকতগুলো নির্বিশেষ বা Type চরিত্র থাকে। যেমন কাজি, কারুয়া বা কারোয়া (ঘটক), জোতদার মোড়ল, দেওনিয়া, ভাড়ুয়া বা স্ত্রৈণ পুরুষ ইত্যাদি। এই সব চরিত্র কোনো একটি বিশেষ যুগের বা কালের নয়, সর্বযুগের, সর্বকালের।

রংপাচালের প্রধানা নারী চরিত্র কখন ও বিমাতার অত্যাচারে জর্জরিতা, উদয়াস্ত পরিশ্রমে ক্লিষ্টা ও শীর্নাঙ্গী। এমন কোনো আপন জন তার নেই, যার কাছে সে তার দুঃখের কথা প্রকাশ করতে পারে। প্রৌঢ় পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে স্ত্রৈণ স্বামীতে পরিণত হয়েছেন। স্ত্রীর কথায় তিনি ওঠেন বসেন। কন্যা পিতাকে কিছু বললে ও পিতা সে কথা গ্রাহ্য করেন না। ফলে কুমারী মন তাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অবশেষে একজন এসে তার মনোবেদনা দূর করে। সে প্রেমিক- ও হতে পারে, আবার প্রেমিকের সন্ধান দাতা, নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় - আত্মীয়া ও হতে পারে।

কোমল নারী হৃদয়ের বিষাদ -মধুর রূপ ফুটিয়ে তুলতে পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রংপাচালকারের জুড়ি নেই। পরপ্রদত্ত শিক্ষার উপর আশ্রয় না করে একান্ত স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় এতদঞ্চলের রংপাঁচাল রচয়িতারা মানবহৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। হাসির কথা বলতে গিয়ে ও জীবনের চরম সত্য কে তাঁরা অস্বীকার করেন নি। আপন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর তাঁরা বহু রংপাচালে রেখে গিয়েছেন।

রং পাচাল মুখে মুখেই রচিত হয়। কেবলমাত্র গানগুলো অনেকে একটি খাতায় লিখে রাখেন। সংলাপের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পাচালকারের ইচ্ছানুসারেই হয়ে থাকে। ভাষাকে অলংকৃত অথবা মার্জিত করার সামর্থ বা প্রবণতা কোনোটিই রং পাঁচালকারের নেই। অনলংকৃত আঞ্চলিক ভাষাতেই রং পাঁচালের রস সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মাঝে পরিবেশিত হয়।

রংপাঁচালের সুর বিলম্বিত নয়ের। কখন ও চার মাত্রায়, কখন ও ছয় মাত্রায় গানগুলি রচনা করা হয়। জটিল তালের গান রংপাঁচালে থাকে না বললেই চলে। বিকৃত কাহারবা ও দাদরার বোল বা ঠেকার উপযোগী তৈরী গান গুলির মধ্যে শ্রোতার মনোরঞ্জনের চেষ্টা রয়েছে। চরণের আদ্যাক্ষরের উপর জোর পড়ে অধিকাংশক্ষেত্রেই। আবার শব্দান্তর্গত কোনো কোনো অক্ষরের উপর অধিক জোর দেওয়ার ফলেই মাঝে মাঝে 'হ' এর আগম হয়। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আমরা ভাওয়াইয়া গানেও লক্ষ্য করেছি।

প্রায় প্রতিটি গানের মধ্যেই থাকে একটি করুণ সুর। সুতরাং যে গানের কথার মধ্যে দুঃখ অথবা মর্মবেদনার প্রকাশ রয়েছে, সেই গানগুলি হয় সর্বাপেক্ষা হৃদয় গ্রাহী। এই গানগুলির কথা ও সুর এমন ভাবে শ্রোতার মনে গেঁথে যায় যে আপন মনে সে যখন অন্য কাজে লিপ্ত হয়, তখন ও সে গানগুলি পূর্বশ্রুত সুরে গাইতে শুরু করে। এই ভাবে অপরাহ্নে গরুর পাল নিয়ে ফেরার সময় বিভিন্ন রংপাঁচালের গান রাখালের কণ্ঠে শোনা যায় এবং মনে হয়, যেন কোন্ এক আপন ভোলা গৃহত্যাগী আপন মনে গান গেয়ে চলেছে। কখন ও বা দূরের হাট থেকে মাল-বোঝাই গরুর গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফেরার সময় গাড়িয়ালের কণ্ঠে নিসৃত রংপাঁচালের গান সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দেয়। এই ভাবেই অলিখিত রংপাঁচালের গানগুলি বহুদিন বেঁচে থাকে লোকের মুখে মুখে।

ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, প্রভৃতি নারী চরিত্রের সঙ্গে রংপাঁচালের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মহুয়া, মলুয়া প্রেমিকা, 'পূর্ণিমা সরী' রংপাঁচালের নায়িকা। পূর্ণিমাসরী ও প্রেমিকা। মহুয়া, মলুয়ার সুখের জীবনে দুঃখের অমানিশা নেমে এসেছিল, পূর্ণিমাসরীর জীবনে ও তাই। তবু ও পূর্ণিমাসরী মহুয়া বা মলুয়া নয়। কারণ মহুয়া ব্রাহ্মণ কন্যা, পূর্ণিমা সরী ফকিন্যা। একথা অনস্বীকার্য যে প্রেমের ক্ষেত্রে জাতিভেদের প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কিন্তু মহুয়ার ট্রাজেডি - ব্রাহ্মন বংশের সন্ততি হয়ে ও সে ব্রাহ্মণ সমাজে চির অপাংক্তেয়া। কারণ জগতে তার পরিচয় বেদেনী রূপে। পূর্ণিমা সরী মহুয়ার মত জাত না দিয়ে ও চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু পরে সে সব ফিরে পেয়েছে। স্বামী পুত্র নিয়ে আবার সমাজের মাঝে নিজের স্থান করে নিয়েছে। মহুয়া, মলুয়ার মত পূর্ণিমাসরী ও অপহৃতা হয়েছিল, সওদাগরের নৌকার মাঝিমাল্লারা তার ক্রন্দন উপেক্ষা করে তাকে নৌকায় তুলে উঠিয়েছিল। কিন্তু মহুয়ার মত রূপ

যৌবনের আবেদন দিয়ে কোনো এক বিশেষ দলের জন্য অর্থোপার্জন করতে হয়নি। পূর্নিমা আগের মতই লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মহুয়ার মত সেও ছিল প্রেমে নিষ্ঠাবতী। তবুও মহুয়া প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। পূর্নিমা " নতুন দিনের নতুন সূর্যের পানে" তাকিয়েছে। মহুয়া সওদাগরের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, কিন্তু স্বামী প্রেম তাতে ক্ষুন্ন হয় নি। পূর্নিমাও সওদাগরের হাতে লাঞ্ছিতা হয়ে ছিল, কিন্তু স্বামীর মুখ বারবার তার মনোদর্পণে প্রতিফলিত হয়েছিল। তবুও পূর্নিমা মহুয়া নয়। মহুয়া " বন্য উদ্দাম তেজে ভরা একটি বিদ্যুৎ;" পূর্নিমা "শান্ত, সমাহিত ধীর প্রদীপ শিখা।"

পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলে খাস পাচাল, মানপাচাল ও রং পাঁচালের মধ্যে শেষোক্ত টি দর্শকদের প্রচুর সমাদর লাভ করে থাকে। পরিশ্রান্ত ও দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন স্বভাবতই একটু রঙ্গরসের অন্বেষণ করে থাকে। জীবন সংগ্রাম এখানে কঠোর, তাই প্রানের আবেগ এখানে প্রবল। সেই আবেগের কথাই রংপাঁচালে স্থান পেয়েছে। একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত না হয়ে এগুলি যদি বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষার একটিতে রচিত হত, তা হলে মনে হয়, এর প্রসার আরও ব্যাপক হত।

—— খাস পাচাল ——

রংপাঁচাল থেকে খাস পাচাল কিছুটা ভিন্ন ধরনের। রং পাঁচালে করুণ দৃশ্যের অবতারনা করা হয়। হাসির প্রবল স্রোতের সঙ্গে বেদনার ফল্গুধারা এসে মিলিত হয়। কিন্তু খাস পাঁচালের আদি ও অন্তে রয়েছে অবিমিশ্র হাসি। করুণ রস যদিও বা মুহূর্তের জন্য সৃষ্টি হয়, পর মুহূর্তেই উদ্দাম হাসির স্রোতে তা ভেসে যায়। এই জন্যেই খাসপাঁচাল রংপাঁচালের তুলনায় লঘু ধরনের হয়। রস-বিচারে রং পাঁচালই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

'খাস' শব্দটি বিদেশী শব্দ (আরবী 'খাস' শব্দ থেকে এটি বাংলা শব্দ ভান্ডারে স্থান পেয়েছে। 'খাস' অর্থ 'নিজ অধিকার ভুক্ত'। এদিক দিয়ে বিচার করলে খাস পাঁচালের নামকরণ যথার্থ হয় নি বলেই মেনে নিতে হয়। কিন্তু রাজবংশী সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় 'খাস' শব্দটির অর্থ আরও কিছুটা প্রসারিত। 'খাস' শব্দটি 'খোস' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। খোস্ বা খোশ্ শব্দের অর্থ আনন্দ (Pleasure) * ফার্সী ভাষায় এই শব্দটির বহুল প্রচলন রয়েছে। যে পাঁচাল গান দর্শকের 'দিল' বা চিত্তকে 'খোস্' করে তাই

'খোস্ পাচাল' বা 'খুশপাচাল'। 'খোস্' বা 'খুশ্' শব্দটি লোকমুখে বিকৃত হয়ে 'খাস' হয়েছে।

সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই গায়ক ও শ্রোতার চিত্ত বিনোদন করা। এদিক দিয়ে বিচার করলে শুধুমাত্র খাসপাঁচালই নয়, সবধরনের সঙ্গীত গায়ক ও শ্রোতাকে আনন্দদানের জন্য রচিত ও গীত হয়। কিন্তু খাসপাঁচাল অত্যন্ত লঘু ও চটুল সুরে গীত হওয়ায় সংগীতের ভাবগাম্ভীর্য এতে বজায় থাকে না। গায়কের খেয়াল খুসি ও 'খোস' মেজাজের উপর খাসপাঁচালের রস দর্শকদের দ্বারা আস্বাদিত হয়। যে পাঁচালগানে শুধুমাত্র হাস্যরসেরই একচেটিয়া অধিকার, যেখানে রঙ্গ তামাশার মাঝে অন্য রসের অধিকার সম্পূর্ন বর্জিত, সেই পাঁচাল হল খাসপাঁচাল। হাস্যরস কখন ও Satire ধর্মী আবার কখন ও Wit এর আলোক ছটায় উজ্জ্বল। খাসপাঁচালে অধিকাংশই যেখানে 'ক্যারিকেচার', সেখানে Humour এর নির্মল শুভ্রতা দর্শকমনে বিশেষ সাড়া জাগায় না।

খাস পাঁচালের অভিনয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধির তুলনায় উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বেশী করে দেখা দেয়। খাসপাঁচালে কোনো স্মারক বা উদ্বোধক (Prompter) থাকে না। চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলবার জন্য Dialogue বা সলাপের কোনো বাঁধা ধরা ছক বা মাপ নেই। বক্তব্যকে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার সময় উক্তিকে ইচ্ছামত বর্ধিত করা যায়। কিন্তু অভিনয় কৌশলের সঙ্গে অভিনেতার হৃদয় বৃত্তির সমন্বয় না ঘটলে খাসপাঁচালের অভিনয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রং পাচাল ও খাসপাচাল সম্পর্কে একথা সমান ভাবে সত্য।

খাসপাঁচালে আপন দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পরোক্ষ ভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। নব্যযুগ যে ভাবে প্রাচীন কৃষ্টি ও ভাবধারাকে গ্রাস করে চলেছে সে সম্বন্ধে প্রতিটি দর্শককে সচেতন করার প্রচেষ্টা রয়েছে খাস পাঁচালের কাহিনী ও অভিনয়ের মধ্যে। তবে একান্ত পরোক্ষ বলেই তা অধিকাংশ দর্শকের কাছে অস্পষ্ট। তাই খাসপাঁচালের হাসিটুকুই তাঁদের কাম্য।

আধুনিক ভাবধারায় লালিত যুবক যুবতীর ঠুনকো প্রেম যে তাদেরই অধঃপতনের পথ প্রেমকাহিনী মূলক খাসপাঁচাল "গাড়ুর চেঙেরী", "রসিয়া বধূ" প্রভৃতি তারই অত্যুজ্জ্বল অভিজ্ঞান। এরে সমাজের যা কিছু গ্লানি, পাপ বা কুপ্রথা তার বিরুদ্ধে খাসপাঁচালকার স্পষ্ট ভাষায় জেহাদ ঘোষণা করেন না। তবুও তাঁর বিদ্রোহী মনের পরিচয় খাসপাঁচালের মধ্যে সংগুপ্ত থাকে না। সমাজের

উপর ওয়ালার ভন্ডামি, স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম্য বিদ্যালয় শিক্ষকের শিক্ষকতা, সরকারী কর্মচারীর অসাধুতা, শহরজীবনের কলুষযুক্ত গ্রাম্য যুবকের বাড়াবাড়ি, চাটুকারের তোষামোদ, ভন্ডযোগী বা সাধুর কুকীর্তি প্রভৃতিকে খাঁসপাঁচালে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

আত্মবিস্মৃত জাতিকে দীর্ঘদিনের মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে হলে যে বড় ধরনের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রয়োজন হয়, 'কমলাকান্তের দপ্তরের' বঙ্কিমচন্দ্র বা 'হুতোম প্যাচার নক্সা'-র কালী প্রসন্ন সিংহের মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই ধরনের বড় প্রতিভা এতদঞ্চলের গ্রাম্য পালাকারের মধ্যে আশা করা বাহুল্য। প্রতিভাবান খাসপাঁচাল কারের অভাবে পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের খাসপাঁচাল দিনের পর দিন 'ক্যারিকেচার' এ পরিনত হচ্ছে, আদিরসের আধিক্যের ফলে পালাগানের শৈল্পিক মান ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে। অথচ প্রথমদিকে যে সমস্ত খাসপাঁচাল এতদঞ্চলে পরিবেশিত হত, তার মধ্যে আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগানোর এক আন্তরিক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য জনসাধারণের মনের উপযোগী করে তৈরী হলে ও পঁচিশ বছর আগের খাসপাঁচালে বর্তমান যুগের মত এতখানি রুচি বিকৃতি ঘটেনি বা আদিরস প্রাধান্য পায় নি।

খাসপাঁচালের আসর বসে মাঠে সামিয়ানার নীচে। কখন ও বা পাটকাঠির বেড়া তৈরী করে আবার কখন ও বা শুধু চট টাঙিয়ে অস্থায়ী সামিয়ানা তৈরী করা হয়। আসরের চারদিক খোলা থাকে। অভিনয়ের জন্য সামিয়ানার ঠিক নিচেই দর্শকদের বসতে দেওয়া হয় না। তাঁদের আসন নির্ধারিত হয় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত স্থান থেকে কিছু দূরে। যাত্রা পালায় যেমন মঞ্চ হিসাবে চৌকি বা খাট ব্যবহৃত হয়, খাসপাঁচালে সে রকম কোনো মঞ্চ বা উচ্চাসন তৈরী হয় না। মাটির উপরেই অভিনেতারা অবলীলাক্রমে অভিনয় করে যান। দর্শকদের বসবার জন্য কোথাও কোথাও চট বা খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়।

খাসপাঁচালের আসর শুরু হয় সন্ধ্যারাত্রেই। যেখানে একাধিক খাসপাঁচালের দলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে সন্ধ্যার আগেই আসর বসে যায়। পালাগান সারারাত ধরে চলে। আসর বন্দনার শুরুতে একটি নাচ হয়। স্ত্রী বেশী পুরুষ নর্তক নৃত্যরত অবস্থায় গোটা আসরের চারপাশ প্রদক্ষিণ না করে কেবল মাত্র অর্ধেকটা প্রদক্ষিন করেন। নৃত্যরত অবস্থায় নর্তক একবার কিছুটা সামনের দিকে এবং তার পরে পিছনের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে আসে। কোনো কোনো আসরে দুই থেকে পাঁচজন পুরুষকে নর্তকীর বেশে নৃত্য করতে দেখা যায়।

নারীর ভূমিকায় সর্বত্রই পুরুষেরা অভিনয় করে থাকেন। নাচের তালে তালে তিন বা ততোধিক বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকে। প্রারম্ভিক নৃত্য সমাপনান্তে রংপাঁচালের মত 'বন্দনা' দিয়ে শুরু হয় খাস পাচালের 'কিচ্ছা' বা কিস্সা।

হাস্যরস সৃষ্টির জন্য যিনি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাঁকে বলা হয় 'মেন বত্তেয়া'। 'মেন' শব্দটি ইংরাজী Main থেকে উদ্ভূত। প্রধান হাস্যরসিক বলেই এঁর নাম 'মেন বত্তেয়া'। 'মেন বত্তেয়াকে সু অভিনয়ের জন্য সাহায্য করেন বত্তেয়া। অনুরূপ ভাবে 'মেন ছক্‌রার সঙ্গে' সহযোগিতা করে 'ছক্‌রা'। 'মেন ছক্‌রা' হল স্ত্রীবেশী পুরুষ। সাধারণ 'ছক্‌রা কখনও নাচে, কখনও নাচের তালে তালে গান করে আবার কখনও বা অভিনয় করে। মেন ছক্‌রা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু অভিনয় করে যান।

খাসপাঁচালের প্রধান সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হল ঢোলক ও হারমোনিয়াম। এ ছাড়া বেহালাও কোনো কোনো দলে ব্যবহৃত হয়। প্রতিযোগিতার সময় ডুগিতবলা, জুড়ি বা করতাল ও ব্যবহৃত হয়। বাদ্যযন্ত্রের নামানুসারে ঢোলবাদককে বলা হয় ঢোলকদার, হারমোনিয়াম বাদককে বলা হয় হারমনিদার, বেহালা বাদককে বলা হয় বেহালাদার, করতাল বা জুড়িবাদককে বলা হয় জুড়িদার।

খাসপাঁচাল সর্বত্রই মিলনাত্মক। কারণ বিষাদাত্মক পরিণতি খাসপাঁচালের মূল রসের অন্তরায়। খাসপাঁচালের প্রতিটি গানই বহুকণ্ঠে গীত হয়। গানগুলি তাই কোরাসধর্মী। সমবেত কণ্ঠে গীত হয় বলেই গানগুলি গভীররাত্রেও বহুদূরের গ্রাম থেকে শোনা যায়। প্রতিটি গানে একটি করে ধুয়া থাকে। প্রথম চার পংক্তি গাইবার পর পরবর্তী পংক্তি বা চরণের শুরুতে গায়কেরা ধুয়া ধরেন।

খাসপাঁচালে প্রত্যেক অভিনেতাকেই গানে কণ্ঠ মেলাতে হয়। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে প্রত্যেকের উচ্চারণ ঠিকভাবে ধরা যায় না। কারণ মিলিত কণ্ঠে গীত হলেও প্রতিটি গায়কের কণ্ঠস্বরের তারতম্য ও ব্যক্তিগত উচ্চারণ ভঙ্গির পার্থক্যের ফলে গানের কথাগুলি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

খাসপাঁচালের অসংখ্য দলের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল কুচবিহার জেলার কাসিয়া-বাড়ীর দল, জলপাইগুড়ি জেলার নাকারুর দল ও মাঝাবাড়ির দল, দার্জিলিং জেলার রাঙাপানির দল।

— মান পাঁচাল —

মানপাঁচাল শব্দটির মধ্যে শ্রদ্ধাভাব বিজড়িত আছে। রংপাচাল ও খাসপাঁচাল থেকে মানপাঁচাল ভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। মান পাঁচালে রঙ্গরসের অবকাশ নেই। 'হাস্যরস কেবলমাত্র Dramatic Rilief দেবার উদ্দেশ্যেই পরিবেশিত হয়।

খাস পাঁচালের মত এতে কোনো 'বত্তেয়া' থাকে না। 'ছকরা' কেবলমাত্র নৃত্য ও নারী-চরিত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

মান পাঁচালের 'প্লট' পাঁচালকারের স্বকপোলকল্পিত নয়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীকে আশ্রয় করে তিনি মান পাঁচালের প্লট তৈরী করেন। মূল কাহিনীকে বিকৃত করার অধিকার পাঁচালকারের নেই। কোনো উপকাহিনীও মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় না। মান পাঁচালের সঙ্গে যাত্রাপালার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুত পক্ষে 'মানপাঁচালকে' পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের 'ধর্মীয় গ্রামযাত্রা' বললে অত্যুক্তি হয়না।

মান পাঁচালের বন্দনা অংশ দেববন্দনায় সমৃদ্ধ। তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণ বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চরণবন্দনার মধ্যে ---- ছাড়া আন্তরিকতার পরিচয় মেলে না। বন্দনাশেষে একক অথবা যৌথ নৃত্য পরিবেশিত হয়। নৃত্য পরিবেশনায় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। রংপাঁচাল বা খাসপাঁচালের মত মান-পাঁচালের নৃত্য লঘুতাল ও চটুল বাদ্যসমৃদ্ধ নয়। মানপাঁচালে নৃত্য ধীর লয়ে পরিবেশিত হয়।

সর্বাপেক্ষা বেশী চরিত্র মানপাঁচালের কাহিনীতে এসে উপস্থিত হয়। কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব ঘেঁসা হয় না। কারণ প্লট মহাকাব্য বা পুরাণাশ্রয়ী। গোটা রামায়ণ ও মহাভারতে যে অসংখ্য কাহিনী, উপকাহিনী ছড়িয়ে আছে প্রধানত: সেগুলির আশ্রয়ে মানপাঁচালের কাহিনী তৈরী হয়। যেমন পরশুরামের মাতৃহত্যা, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, নল দময়ন্তী, সীতার অগ্নি পরীক্ষা, সীতার পাতাল প্রবেশ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ, প্রহ্লাদ, সাবিত্রী ও সত্যবান, কৃষ্ণার্জুন ইত্যাদি।

'মান'শব্দটি সম্মানার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। যে পাঁচাল দর্শকমনে মান বা শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত করে তাই মানপাঁচাল। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সাধারণ মানুষের পরিচয় সহসা হয়ে ওঠে না। নিরক্ষর গ্রামমানুষের মনের দুয়ারে মানপাঁচাল-কার মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী ও উপকাহিনীকে সহজ ও সরল ভাবে উপস্থিত করেন। উপস্থাপনা তাই একান্তভাবেই গ্রাম্য লোকমানসের উপযোগী।

খাসপাঁচালের ও রংপাঁচালের মত মান পাঁচালও ফরমায়েসী রচনা নয়। মান-পাচালের তাই সর্বত্র রচয়িতার ভক্তিনম্র অন্তরের শুচিস্নাত রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। হাস্যরস থাকলেও তা পাঁচালের অন্তর্গত কোনো চরিত্রকে নিয়ে নয়। সেই কারণেই মূল কাহিনীর গাম্ভীর্য লঘু হাস্যরস নষ্ট করতে পারে না।

মান পাঁচালে বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা রংপাচাল ও খাসপাচালের তুলনায় অধিক। কারণ মানপাঁচাল অনেকটা যাত্রাপালার ঢংএ পরিবেশিত হয়। সেই জন্যেই হারমোনিয়াম

ও ঢোলক ছাড়াও সহযোগী বাদ্যযন্ত্র রূপে ফ্লুট, কর্ণেট, বেহালা, তবলা ও করতাল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। মান পাঁচালে যাত্রাগানের বিবেকের অনুরূপ একটি চরিত্র পাপী বা অন্যায়কারী কে ধর্মকথা শুনিয়ে সাবধান করে দেয়। ধর্মকথা সুসহযোগে পরিবেশিত হয়।

মানপাঁচালে পোষাকের জাঁকজমক ও আড়ম্বর রংপাচাল ও খাসপাঁচালের তুলনায় অনেক বেশী। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাণী, রাজকুমারী, যুবরাজ প্রত্যেকেই জমকালো পোষাকে আসরে অবতীর্ণ হয়। প্রতিটি চরিত্রই যাত্রাপালার ঢঙে কথা বলেন ও অঙ্গভঙ্গি করেন। আমাদের বিশ্বাস, মানপাঁচালের কাহিনী আগামী দুই দশকের মধ্যে শুধুমাত্র মহাকাব্য বা পুরাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বাংলার যাত্রা পালার অনুকরণে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নানা ধরণের কাহিনীও এর মধ্যে স্থান করে নেবে।

:: গ্রামযাত্রা ::

— সাগর ভাসা —

(কাহিনী)

অত্যাচারী রাজা রণজিৎ সিং। তাঁর অত্যাচারে রাজ্যের সব প্রজারাই অসন্তুষ্ট। প্রজাদের মনে সুখ নেই। রণজিৎ সিংএর মন্ত্রী একদিন কথা প্রসঙ্গে রাজাকে জানায় যে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা অজয়সিংহ অমিত বিক্রমশালী রাজা — যাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় রণজিৎ সিংএর জয়লাভ হয়ত সুনিশ্চিত নয়। নরোত্তমের কথায় স্বীয় শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে অজয় সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রচন্ড যুদ্ধের পর অজয় সিংহ পরাজিত হলেন। এবার রণজিৎ সিং জানায় যে রাজ্যজয় তার উদ্দেশ্য নয়, নিজের শক্তি যাচাই করার জন্যই অজয় সিংহের বিরুদ্ধে তার এই আক্রমণ। রণজিৎ সিংহ অবশ্য যুদ্ধ জয়ের পর অজয় সিংহকে মিত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এর কিছু দিন পরে মৃগয়া শেষে রাজ প্রাসাদে ফেরার পথে রণজিৎ সিংহ বনে পথ হারিয়ে লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত এক গৃহীর পর্ণ কুটীরে আশ্রয় নিলেন। গৃহকর্ত্রী সে সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। আহার শেষে রাজাকে গৃহাভ্যন্তরে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে পতি পত্নী গৃহীগৃহের বারান্দায় রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় নিলেন।

গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন রাজা রণজিৎ সিং হঠাৎ জেগে উঠলেন এক দুঃস্বপ্ন দেখে। বিধাতা পুরুষ স্বপ্নের ঘোরে তাকে জানান যে গর্ভবতী গৃহকর্ত্রীর ভাবী সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে। দুঃস্বপ্নকে অস্বীকার করার মত মনোবল রণজিৎ সিংহের ছিল না। তাই সে আশ্রয়দাতার পত্নী কে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিছুদিন পরে কারাগারে সাগরভাসার জন্ম হয়। নবজাত শিশুর কথা চিন্তা করে স্বীয় প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে

একটি কাঠের বাক্সে বন্দী করে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিলেন ।

অজয় সিংহের রাজ্যে কতিপয় ধীবর সাগরের তীরে (বড় নদীর তীরে) মৎস্য শিকারে রত ছিল । দিনের উজ্জ্বল আলোয় সাগরের জলে একটি বড় কাঠের বাক্স ভেসে আসতে দেখে তারা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে সেটিকে তীরে উঠিয়ে আনে এবং অবাক বিস্ময়ে ~~তারা~~ জেলেরা নবজাত শিশুটিকে লক্ষ্য করে । অবশেষে ~~তারা~~ শিশুটিকে অজয় সিংহের হাতে সমর্পণ করে । সাগরে ভেসেছিল বলে শিশুর নাম হল সাগরভাসা ।

রাজপ্রাসাদে সাগরভাসা বড় হয় । একই সঙ্গে বড় হতে থাকে অজয় সিংহের কন্যা বিষয়া । একটু বড় হলে পড়ুয়াদের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে সাগরভাসা রাজা অজয় সিংহকে তার পিতৃপরিচয় প্রদান করতে বলে । অজয় সিংহ নিজেকেই সাগরভাসার পিতা বলে পরিচয় দেয় । ইতিমধ্যে সাগরভাসার পিতা পত্নীকে হারিয়ে মনের দুঃখে অজয় রাজার রাজ্যে এসে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে পত্নীর বন্দীদশায় পুত্র জন্মের প্রসব , সাগরের জলে পুত্রের জীবননাশের চেষ্টা, ধীবরদল কর্তৃক পুত্র উদ্ধার সব খবরই পাচ্ছিলেন। যখন সাগরভাসাকে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের অন্বেষণ করা হচ্ছিল , তখন সাগরভাসার পিতা নিজে ঐ শিক্ষাকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন ।

এর কিছু দিন পরে রাজা রণজিৎ সিং জানতে পারে যে সাগরে বিসর্জিত বালক সশরীরে অজয় সিংহের রাজ্যে বাস করছে । প্রাণভয়ে ভীত রাজা তৎক্ষণাৎ দূতের হাতে চিঠি পাঠালেন , 'পত্রপাঠ সাগর ভাসাকে বিষ দান করবে । পত্রদূত যখন অজয় সিংহের রাজ্যে প্রবেশ করলেন , তখন তিনি পথশ্রমে শ্রান্ত । বিশ্রামের জন্য বিশাল রাজসরোবরের এক প্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়াতলে শয়ন করা মাত্রই নিদ্রামগ্ন হলেন । সেই ঘাটে রাজকন্যা বিষয়া তার সখীদের নিয়ে জলকেলি করছিলেন । বিদেশী রাজদূতের হাতে পত্র দেখতে পেয়ে রাজকন্যা ও সখীগণ কৌতূহল বশতঃ সেই পত্র পাঠ করলেন ও 'বিষ' এর স্থানে 'বিষয়া' লিখলেন । রাজদূতের পত্রপাওয়ামাত্রই অজয় সিংহ সাগরভাসার হাতে কন্যা বিষয়াকে সম্প্রদান করেন ।

বিধাতাপুরুষের ইচ্ছায় সাগরভাসার সঙ্গে তার পিতার পরিচয় হয় এবং একদিন অরণ্যপথে পরিভ্রমণ কালে বনহরিণীর জলপানের শব্দ লক্ষ্য করে সাগরভাসা শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন । কিন্তু বাণবিদ্ধ হরিণীর পরিবর্তে মৃত্যুপথযাত্রী রমণীর কাতর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে পিতাপুত্র উভয়েই অকুস্থলে ছুটে যায় । সাগর ভাসার পিতা তার ধর্মপত্নীকে এবার চিনতে পারে ।

শোকাহত পিতা এবার পুত্রের কাছে তার মৃত্যুর কঠিন সঙ্কল্প জানায় । কিন্তু বিধাতা পুরুষের কৃপায় মৃত পত্নীও প্রাণ ফিরে পায় । এইভাবে পিতামাতা ও পুত্রের পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় । অজয়সিংহেরও পরে একদিন

জানতে পারে, সাগরডাঙ্গার জন্য নিযুক্ত শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে সাগরডাঙ্গারই পিতা। অজয় সিংহ তৎক্ষণাৎ তাকে সেনাপতির পদে বরণ করলেন।

এবার অত্যাচারী রাজা রণজিৎ সিংহের উপর প্রতিশোধ নেবার পালা। প্রতিশোধ নেবার ভার সাগরডাঙ্গার উপর ন্যস্ত হয়। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও পরাক্রমশালী যুবক সাগরডাঙ্গার কাছে রণজিৎ সিংহ পরাজিত ও নিহত হল। এই ভাবে বিধাতা পুরুষের লিখন সত্য হল।

সাগরডাঙ্গার মূল কাহিনী কিছুটা বাস্তবাশ্রিত হলেও বেশীর ভাগই কাল্পনিক। কাহিনীর সঙ্গে বঙ্গীয় রূপকথার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। মূলকাহিনীর সঙ্গে কোনো উপকাহিনী যুক্ত না হলেও আলোচ্য পালাগানটি চারঘন্টা থেকে ছয় ঘন্টা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। কাহিনী কল্পনাশ্রয়ী হলেও Imagination কখনও কখনও Reality-র কাছে পরাভূত হয়েছে। বাস্তব জগতে বিচরণশীল কোনো মানুষ রণজিৎ সিংহকে তার ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়নি। 'ঈডিপাস' নাটকের মত কোনো বৃদ্ধ ভবিষ্যত বক্তা এসে রক্তসম্পর্কীয় কোনো আপনজনের কাছে রাজার মৃত্যুর কথা জানায় নি। স্বপ্ন লোকে বিচরণ কালে রাজা রণজিৎ সিংহ তার মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিল। বাস্তবজগতে ফিরে এলেও মগ্ন চৈতন্য তার চেতনমনকে সাড়া দিয়ে তাকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছে। এক দুর্নিবার শক্তির হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না পেরে রাজা যেমন স্বপ্ন মর্তধূলির জীবনকে আঁকড়ে ধরার জন্য গর্ভবতী পরস্ত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেও পিছু হটে নি, অপাপবিদ্ধ শিশুকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে তেমনি এতটুকুও বিচলিত হয় নি। অজয় সিংহের রাজ্যে সাগরডাঙ্গার অবস্থিতি জানতে পেরে তাকে বিষদানে হত্যা করার নির্দেশ দানের পেছনেও রয়েছে রণজিৎ সিংহের জীবনকে আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। অথচ নিজের জীবনকে ভালবাসলেও প্রকৃতপক্ষে সে জীবনপ্রেমিক নয়। কারণ প্রজার জীবন সম্বন্ধে সে কখনও পিতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় দেয় নি। তাই রাজ্যব্যাপী প্রজা অসন্তোষ – পাপী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের মূক ক্রোধ।

'সাগর ডাঙ্গা' পালাটি বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'ঈডিপাসের কথা' মনে করিয়ে দেয়। দুই কাহিনীর উৎসে রয়েছে ভবিষ্যতবাণী—যে বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। দুই কাহিনীতে সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু ঈডিপাসের পরিণতি ট্রাজিক। সাগরডাঙ্গা ট্রাজিকধর্মী হয়েও মিলনান্তক। আর সেইজন্যেই কাহিনীর অন্তিম পরিণতি দর্শকচিত্ত জয় করেছে। দুঃখের অমানিশার মধ্যে সুখের নিটোল মুক্তা কিছু বিনা চন্দ্রালোকেই ঝলমল করেছে। মহাভারতের 'যেথা ধর্ম সেথা জয়' – নীতি শিক্ষাটি পরোক্ষ ভাবে উক্ত পালাগানের মাধ্যমে গ্রাম্য জনগণের মনের দুয়ারে উপস্থিত করা হয়েছে। সাগরডাঙ্গা তাই মূলতঃ লোকশিক্ষা মূলক করুণ রস প্রধান মিলনান্তক পালাগান।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সাগরডাঙ্গা , নৃপতি অজয়সিংহ, কন্যা বিষয়া এবং মন্ত্রী নরোত্তম প্রধান ।

সাগরডাঙ্গা নিষ্পাপ , কলুষমুক্ত । কিন্তু গ্রীক্ নাটকের Nemesis এর মত তাকেও নিয়তির হাতের খেলার পুতুল সাজতে হয়েছে । নিজ অধ্যাবসায় ও বুদ্ধির বলে সে যুদ্ধ বিদ্যা ,রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করেছে । কিন্তু ভাগ্যচক্রে তারই নিক্ষিপ্ত শরে মাতা আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে ।

সাগরডাঙ্গার মাতার মৃত্যুর পর বিধাতাপুরুষের ইচ্ছায় পুনর্জীবন লাভ – এ অংশটুকু বাস্তবের সঙ্গে একান্ত ভাবেই সম্পর্কশূণ্য । মনে হয় , গ্রাম্যপালারচয়িতা রামায়ণ মহাকাব্যের দশরথের মৃগয়া অংশটুকু সচেতন ভাবে গ্রহণ করে তাকে সামান্য পরিবর্তন করেছেন । দশরথের শরাঘাতে অন্ধমুনির পুত্রের মৃত্যুকাহিনীকে পরিবর্তিত করে সাগরডাঙ্গার জন্মদাত্রী মাতাকে সেখানে স্থাপন করেছেন । এইভাবে মূল কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে সাগরডাঙ্গার জীবনের একাধিক মুখ্য ও গৌণ ঘটনার দ্বারা ।

বিষ্মা রাজা অজয় সিংহের একমাত্র কন্যা । তার নারী হৃদয়ের কোমল দিকটি একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্ফুট হয়েছে । সে কৌতূহলী; কিন্তু চাপল্য তার স্বভাব বিরুদ্ধ । ভাবী স্বামীর প্রাণ রক্ষায় বিধাতা পুরুষেরইচ্ছার পরিবর্তে তার উপস্থিত বুদ্ধিই কাজ করেছে । বিষয়াকে কাহিনীর সর্বত্র পাওয়া যায় না । কিন্তু বিষয়া ছাড়া সাগরডাঙ্গা পালাগান অসম্পূর্ণ । বিষয়া সাগরডাঙ্গার রক্ষাকর্ত্রী – তার ভবিষ্যৎ সুখী জীবনের যোগ্য সঙ্গিনী ।

অজয় সিংহ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রাজা রণজিতের বিপরীত । তিনি প্রকৃত রাজা – অসংখ্য সদ্গুণের আধার । সত্যিকারের প্রজাবৎসল বলেই প্রজার মঙ্গল তাঁর একমাত্র চিন্তা। রাজপোষাকের অন্তরালে তাঁর চিরন্তন পিতৃসুলভ মনোভাব লুপ্ত থাকে নি । অসহায় শিশু সাগর ডাঙ্গাকে তিনি শুধু আশ্রয় দেন নি । তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাকে তিনি নিজ রাজ্যের সুযোগ্য নাগরিক রূপে পরিণত করতে চেয়েছেন । সে বাসনা তাঁর সফল হয়েছে । সাগরডাঙ্গার মত উপযুক্ত ছেলের হাতে নিজকন্যা বিষয়াকে দান করতে পেরে কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন ।

সাগরডাঙ্গার মাতৃপরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না । বেশীর ভাগ সময়েই তিনি দর্শকচক্ষুর অন্তরালে অশ্রুমোচন করেছেন । এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল । কিন্তু কোন্ অপরাধে তাঁকে জীবনের সুখের দিন গুলিতে দুঃখিনী সাজতে হয়েছিল সে বিষয়ে পালাকার নীরব । কিন্তু সে সতী , সীতা , সাবিত্রী , দময়ন্তীর মতই পুণ্যবতী । তাই তিনি বিধাতা পুরুষের ইচ্ছায় নবজীবন লাভ করে সুখে দিনাতিপাত করেছেন । কাহিনীর মধ্যে নীতিকথা কোথাও স্পষ্ট ভাবে কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত

হয়েছে। কাহিনী কল্পনাশ্রয়ী হলেও লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে এতদঞ্চলে সাগরডাসা পালাটির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

সাগর ডাসার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। (১) লোকচিত্ত বিনোদন (২) সমাজের নৈতিক শিক্ষাদান। নীতিকথার নীরস কাঠিন্য মনোহর কাহিনী ও সুরের প্রবাহে তলিয়ে যায় বলেই সাগরডাসার আবেদন আজও এতদঞ্চলের লোকমানসে এত প্রবল।

– রূপভান –

(কাহিনী)

নিঃসন্তান একাব্বর বাদশার মনে সুখ নেই। রাজ্যের প্রজাদের কাছে তিনি আটকুড়ে। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর বরে বাদশা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। সন্ন্যাসী বিদায় নেবার আগে জানান, বাদশার পুত্রের জন্মের বারো দিনের মধ্যে যদি বারো বৎসরের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ না হয়, তবে বারো দিন পরে শিশুর মৃত্যু হবে, তার বিবাহ হলে পুত্র শত বছর পরমায়ু লাভ করবে। সন্ন্যাসী আরও জানান, বিবাহের পরেই স্বামী-স্ত্রী কে বারো বছরের জন্য বনবাস যাপন করতে হবে।

পুত্র রহিমের দীর্ঘজীবনের আশায় একাব্বর বাদশা তাঁরই উজিরের বারো বছরের কন্যা রূপভানের সঙ্গে রহিমের বিবাহের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব অসম্ভব বিবেচনা করে উজির একাব্বর বাদশাহের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেন। এর ফলে উজিরকে বাদশাহের হাতে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হতে হয়। অবশেষে রাজ্যের কল্যাণ কামনায় রূপভানের সম্মতি ক্রমে বারো দিনের রহিমের সাথে তার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই রূপভান শিশু স্বামী কে কোলে নিয়ে বনগমন করে।

অরণ্যবাসী বেদে দেবরাজ ছিল জংলী মানুষদের সর্দার। পেশা তার ডাকাতি হলেও অন্তরের কোমল ভাবটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় নি। জঙ্গল সর্দার দেবরাজ অসহায়া রূপভানকে মা বলে সম্বোধন করে। দেবরাজ রূপভানকে শত আপদে বিপদে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। লম্পট শায়েদ বাদশা রূপভানের বনবাসের খবর পেয়ে যখন তাকে হরণ করতে আসে তখন সর্দার দেবরাজই তাকে লম্পট শায়েদের হাত থেকে রক্ষা করে।

একটি দুটি করে বারো বছর কেটে যায়। রহিম ও রূপভানের বনবাস যাপন ও শেষ হয়। এরপর রহিমকে রূপভান শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে পাঠায়। বিদ্যা-শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রহিমকে রূপভান নিজের পরিচয় দেয় না। অর্থাৎ সে যে তার স্ত্রী – এ পরিচয় গোপন রাখে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হলে রূপভান রহিমকে তার আসল পরিচয় জানায়। পরিচয় শেষে নতুন করে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে। লম্পট শায়েদ রূপভান ও রহিমের উপর যে অত্যাচার করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে তার

একমাত্র কন্যা তাজেলকে রহিমের হাতে সমর্পণ করে। এইভাবে রহিম ও রূপভান অভিশপ্ত দিনগুলিকে পিছনে ফেলে দাম্পত্য জীবনের নতুন ক্ষেত্র রচনা করে।

রহিমবাদশা ও রূপভান কন্যা পালাগানটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কাহিনীতে মৌলিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উক্ত পালাটির রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে মুস্লিম সমাজের যে চিত্র আলোচ্য পালাগানে রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়, 'রহিম বাদশা ও রূপভান' পালাটির জন্ম তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী নয়। বন্দনা অংশে প্রথমেই আল্লা রসুলের চরণ বন্দনা করা হয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী বন্দনা অনেক পরে এসেছে। কাজেই অনুমিত হয়, উক্ত পালাগানের রচয়িতা জনৈক মুসলমান। বন্দনা অংশে হিন্দুদেবদেবীর উল্লেখের পেছনে সম্ভবত: যে কারণটি রয়েছে, তা হল একই আসরে হিন্দু ও মুসলমান – উভয় শ্রোতার উপস্থিতি কালে শুধুমাত্র আল্লারসুলের চরণ বন্দনার মধ্যে পালাকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে পালাকার সম্ভবত: সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই আল্লা রসুলের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও তিনি আসরে আহ্বান করেছেন। বলাবাহুল্য, পালাকার স্বল্পশিক্ষিত হলেও তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পালারচনায় অনেকখানি সাফল্য এনে দিয়েছে।তাছাড়া পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছে। এর ফলে হিন্দু ও ঐশ্লামিক ভাবধারা উভয় সম্প্রদায়কেই প্রভাবিত করেছে। সেই প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল এতদঞ্চলের সঙ্গীতে, পূজার্চনায়, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পকলায় পরিলক্ষিত হয়। রূপভান পালাগান হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির সমন্বিত রূপের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নিরক্ষর অথচ সরলমনা গ্রাম্য দর্শকের মনে আবেদন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই রহিম বাদশা ও রূপভান কাহিনীর মধ্যে একাধিক অলৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। শুধু সঙ্সার ক্ষেত্রে বিচরণশীল লম্পট শায়েদ বাদশাই নয়, অরণ্যের হিংস্রবাঘও রূপভানের সতীত্বের কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। পেশা ও নেশা দস্যুবৃত্তি হলেও অরণ্যের সর্দার দেবরাজ নাবালিকা রূপভানকে মা বলে সম্বোধন করে একান্ত আপনার করে নিয়েছে। অনাড়ম্বর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে আজন্ম-লালিত গ্রামীন মানুষ রূপভান পালা দর্শন ও শ্রবণ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেই সঙ্গে নীতি শিক্ষাও গ্রহণ করে থাকে। অথচ কোথাও নীতি শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা নেই। কাহিনীর প্রয়োজনেই সতীত্ব ও আদর্শের জয় ঘোষিত হয়েছে — নীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশে নয়।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে প্রধান হল রূপভান, জাহানারা, রাহেলা ও তাজেল
এ ছাড়া আছে কতগুলি গৌণ স্ত্রীচরিত্র। যেমন মুংড়ি, ছপিয়া, দাইমা, মায়েলে মাইলানী, পোদ্দারণী। এরা হিন্দু ও মুস্লিম উভয় সমাজ থেকেই এসেছে। একাব্বর বাদশা, উজির, রহিম, শায়েদ বাদশা, দেবরাজ, জহুরী, শিক্ষক, দারোয়ান, জল্লাদ, কাজী, পথিক, পাগলা, ছাত্র ও মাঝি – এক কথায় সবধরণের মানুষ রূপভান পালাগানে স্থান পেয়েছে। চরিত্রগুলির অধিকাংশই 'টাইপ'। রূপভানকে প্রথমেই দেখি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা রূপে। সে সুন্দরী, শুধু শায়েদের চোখে নয় দর্শকের চোখেও। আরও দশটি গ্রাম্য নারীর মত তার ভাগ্যও ছিল অনিশ্চিত। ভবিষ্যত জীবনে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে সামান্য ধারণাও তার ছিল না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সে জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে। ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধকার সে চিনতে ও বুঝতে শেখে। স্থূল শিক্ষিত পালা কারের কৃতিত্ব যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা রূপভান চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যেই রয়েছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে একাব্বর বাদশার বারো দিনের শিশুপুত্র রহিমকে পতিত্বে বরণ করে তাকে বনগমন করতে হয়েছিল – যেখানে জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল ষোল আনা। কিন্তু তার সতীত্ব, তার সরলতা ও উদারতা শেষ পর্যন্ত তাকে বাঘ, ডাকাত ও লম্পটের কবল থেকে রক্ষা করেছিল। রূপ-ভানের পরিণতি তাই ট্রাজিক নয়। আত্মীয় পরিজনকে বিষাদ স্রোতে না ভাসিয়ে সে ভবিষ্যত সুখী জীবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। কঠোর পরীক্ষার পর রূপভানের এই গৃহ-প্রবেশে দর্শক চিত্তও উৎফুল্ল হয়েছে। পালাগানের শেষে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

শায়েদ বাদশা নারী লোলুপ, বিশ্বাস ঘাতক। কিন্তু তার মধ্যে মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জিত হয় নি। সে পালাগানের 'ভিলেন' হলেও মানুষরূপী পশু নয়। রূপভানকে ছলে বলে কৌশলে সে অধিকার করতে চেয়েছিল, জঙ্গলসর্দারের সঙ্গে তার ব্যবহার আদৌ বাদশার মত নয়, সে আত্মম্ভরী, তার সলাপ থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। তবুও সে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত শয়তান নয়। পালাগানের শেষের দিকে তাকে অনুতপ্ত ও প্রায়শ্চিত্ত কামী পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। যে রূপভানকে সে বলপূর্বক হরণ করতে চেয়েছিল, তারই হাতে আপন ঔরসজাত কন্যাকে দাসীরূপে তুলে দিয়েছিল।

একাব্বর বাদশা মধ্যযুগীয় মুস্লিম সুলতান দের প্রতিনিধি। তিনি উদার, স্নেহপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল। কিন্তু এই ত্রিবিধ মানবিক গুণসম্পন্ন হয়েও তিনি ছল চাতুরীকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। বনের রাজা দেবরাজের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মূল পার্থক্য হল এই যে দেবরাজ যেখানে ন্যায়দণ্ডধারী, একাব্বর সেখানে প্রয়োজনবোধে ন্যায়, নীতি বোধকে পদদলিত করতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন না। উজির সাহেব

সাহেব যখন বাদশাহের অনুরোধ সত্ত্বেও রূপভানের বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তখনই তিনি তাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করলেন। এই শাস্তি বিধান একমাত্র মধ্যযুগীয় মুসলিম সুলতানদের পক্ষেই সম্ভব। অথচ তাঁর মধ্যে পিতার স্নেহমমতা ছিল। প্রজার কল্যাণকামী বাদশা হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু উজিরের প্রতি এই নির্মম ব্যবহার তাঁর চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে।

দেবরাজ আদর্শের প্রতিমূর্তি। সে নামে মাত্র জলী রাজা। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করলেও সমগ্র নারী জাতি তার কাছে মাতৃস্থানীয়া। পালাগানের শেষে যখন শায়েদ বাদশাকে তার কাছে উপস্থিত করা হয়েছে, তখন দেবরাজ বলছে, 'হামি তুহারে মুক্ত করতে পারি। কিন্তু হামার কাছে কারাল করতে হবে। ..... এই সারে জাহানের নারীকে মা বলে ডাকতে হবে। পারিবে মা বলে ডাকতে?'

রূপভান পালাগানে মানুষের সহজাত সংস্কার, প্রবৃত্তি, আদর্শ প্রভৃতিকে তুলে ধরেছেন পালাকার। রূপভান ও জাহানারার বিলাপে গৃহী মানুষের বেদনার দিকটি যেমন তুলে ধরা হয়েছে, রূপভান ও রহিমের মিলন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তেমনি সুখী মানব মানবীর চিত্র সুঅঙ্কিত হয়েছে। মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতীর সৃষ্টি যে দেশে, সেই পূর্ব বাংলার মাটিতেই রূপভান পালাগানের জন্ম বলেই যে চিরন্তন আবেদন ও বৈশিষ্ট্যগুলি ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম পালা ত্রয়ীতে দেখা যায়, রূপভান পালাগানে তার অভাব ঘটে নি — যদিও রূপভান গাথাগীতিকা নয় — পালাগান মাত্র।

রাজনৈতিক বন্ধন কোনোদিনই সংস্কৃতির গতিরোধ করতে পারেনি। তাই রূপভান পালাগান খুব বেশিদিন পূর্ববাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে থাকে নি। রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করে আলোচ্য পালাগান পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বহিরাগত সংস্কৃতির কোনো একটি উপাদান কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনমানসে আবেদন সৃষ্টি করলেই সেই সাংস্কৃতিক উপাদান যে তৎক্ষণাৎ উক্ত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হবে এমন কোনো কথা নেই। গ্রহণ ও স্বাঙ্গীকরণ এক জিনিষ নয়। পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি হলেও পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের পরতে পরতে এই পালাগান এমন ভাবে মিশে গেছে, যাতে পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি বলে রূপভান পালাগানটিকে স্বতন্ত্র করা যায় না।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃতির Life Factor যেখানে যত বেশী, সেখানে তত দ্রুত। পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি আজও যে নেপালী ভুটানী, বিহারী বা অসমীয়া সংস্কৃতির চাপে স্বীয় মৌলিকতা বিসর্জন দেয় নি, তার প্রধান কারণ পূর্বোক্ত Life Factor এরই সহায়তায় অন্যান্য সংস্কৃতির কাছ থেকে পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের একাধিক উপাদান গ্রহণ করে তাদের স্বাঙ্গীভূত করেছে। অনুকরণ যে একেবারে নেই তমন নয়, তবে তা অন্ধ অনুকরণ নয়। এই কারণেই আলোচ্য

~~অসমের~~ অঞ্চলের সংগীতমাত্রই নয়, সংস্কৃতির প্রতিটি উপাদানই স্বমৌলিকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

— তিস্তাবুড়ীর গান —

তিস্তাবুড়ীর গানগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

(১) চুমানী

(২) ভেদেই খেলার গান

(৩) পূজাকালীন গান

চুমানীকে আবাহন গীত বলা যায়। তিস্তাবুড়ীর পূজার প্রারম্ভে এই গীতের মধ্য দিয়ে দেবীমাহাত্ম্য আংশিক ভাবে বর্ণিত হয়। গানগুলিতে গায়িকার অভিপ্রেত বা মনোবাসনা প্রকাশিত হয়। তিস্তাবুড়ীর গানের চুমানী অংশ সর্বদাই বিশেষ সময়ে গীত হয়। দেবীর প্রতীক রূপে গায়িকারা একটি মাটির অথবা ধাতুনির্মিত ঘট বহন করে বেড়ায়। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও একটি ছাতা ঘটের ওপর মেলে রাখা হয়। প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে তিস্তাবুড়ীর জলপূর্ণ ঘট নামানো হয় গোবরমাটি দ্বারা নিকানো একটি বিশেষ স্থানে এবং তার পরেই শুরু হয় চুমানী বা আবাহন গীতি। এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে অন্য গৃহস্থের বাড়ীতে ঘট বহন করে নিয়ে যাবার সময় পথে দেবীর উদ্দেশ্যে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলা হয় ভেদেই খেলার গান। এ গান আবাহন গীতি থেকে মূলতঃ ভিন্ন। এই গানের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রতিস্তরের যুবক অথবা যুবতীদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে বয়স্থা অবিবাহিত যুবক যুবতীদের কথা ভেদেই খেলার গানে বার বার উল্লেখ করা হয়। ভেদেই খেলার গান কখনও ঘটস্থাপনের সময় গীত হয় না। গৃহস্থের বাড়ী থেকে ঘট উঠিয়ে নেবার পর পথিমধ্যে শুরু হয় ভেদেই খেলার গান। সম্ভবতঃ এক বিশেষ ধরণের আনন্দ প্রদানই এ গানের মূল উদ্দেশ্য। তিস্তাবুড়ীর পূজার জন্য যখন বাড়ী বাড়ী স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল ঘট নিয়ে বেড়ায় তখন তারা স্বভাবতঃই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তি অপনোদন করার জন্যই ভেদেই খেলার গানগুলি জন্মলাভ করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পূজাকালীন গান কোনো বাড়ীতে বা পথে গীত হয় না। নদীর তীরে তিস্তাবুড়ী পূজার সময় এই গানগুলি শোনা যায়। এর উদ্দেশ্য দেবী তিস্তার সন্তুষ্টি সাধন। তিস্তামাঈয়ের পূজার বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ এর মধ্যে রয়েছে। যে অঞ্চলে নিকটবর্তী কোনো নদী নেই, সেখানে দিঘি বা জলাশয়ের ধারে তিস্তাবুড়ীর পূজা ও গান হয়।

তিস্তাবুড়ীর গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী লোকেরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকেন।

পুরুষেরা স্ত্রী লোকের সঙ্গে একত্রে তিস্তাবুড়ীর গান গায় না । উপবাসী স্ত্রীলোকেরা পূজার কিছুদিন আগে ভিক্ষায় বের হয় । এই সময় চুমানী এবং ভেদেই শ্রেলার গান গীত হয় । একবার গান আরম্ভ হলে সে গান নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ হয় না । তিস্তাবুড়ীর গানগুলির সময় পরিধিকে অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । অষ্টপ্রহর নামসঙ্কীর্তনে যেমন কোনো ছেদ বা বিরতি থাকে না , তেমনি তিস্তা-বুড়ীর গানের মাঝে কোনো বিরতি নেই । এ গান একনাগাড়ে গাওয়া হয় । গৃহস্থের আঙ্গিনায় গানের চুমানী অংশ শুরু হয় , পথে ভেদেই শ্রেলার গান এবং পুনরায় আর এক গৃহস্থের বাড়ীতে চুমানী শুরু হয় । এইভাবে উপবাসী স্ত্রী লোকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিস্তাবুড়ীর গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে ।

তিস্তাবুড়ীর গানের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এ গান কখনও এককভাবে গীত হয় না । সর্বত্রই সমবেত কণ্ঠে গীত হয় । দ্বিতীয়তঃ পুরুষেরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্রে গান গায়না বা গাইতে পারে না । এ গান স্ত্রী ও পুরুষের কণ্ঠে স্বতন্ত্র ভাবে গীত হয় ।

— বিষহরার গান :—

বিষহরার গানে দেবী মনসার স্তবগান করা হয় । প্রত্যেক দেবদেবীর মত মনসারও দুটি রূপ আছে । একটিশান্ত অপরটি উগ্র । বিষহরার গানে দেবী মনসার শান্ত রূপের ভজনা করা হয় । দেবী সন্তুষ্ট হলে মানুষ শুধু বিষধর সাপের কবল থেকেই রক্ষা পায়না, বিবাহ , অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় । তাই যিনি মনসার সেবক তিনি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে নিজগৃহে বিষহরার পূজা ও গানের ব্যবস্থা করেন । এর ফলে দেবী সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর ভয়ঙ্কর রূপকে সম্বরণ করে দয়াময়ীরূপে ভক্তকে শুভফল প্রদান করে থাকেন ।

পদ্মাপুরাণের কাহিনীর কাঠামোটিকে অবলম্বন করে বিষহরার গানের রচয়িতা ও গায়ক আপন ইচ্ছানুযায়ী মূল বিষয়বস্তু পুনর্বিন্যাস করে নিতে পারেন । গানের মাঝে মাঝে কিছু সলাপ যোগ করা হয় । বিষহরার গান সমবেত কণ্ঠে গীত হয় এবং বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের কাহিনীটি নাট্যগীতির আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয় । পদ্মাপুরাণের প্রতিটি চরিত্র — যেমন চাঁদসদাগর , বেহুলা , লক্ষ্মীন্দর , মনসা, সনকা, নেতা প্রত্যেকেই জমকালো পোষাকে আসরে অবতীর্ণ হন । এঁরা প্রত্যেকেই অভিনয় করেন আবার সঙ্গীতে কণ্ঠদান করে থাকেন । বিষহরার গানকে এতদঞ্চলে বেহুলার ভাসানও বলা হয় ।

আমাদের অভিমত, বিষহরার গান Sectarian Literature বা ধর্মীয় সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। কারণ বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত গানের আয়োজন করা হয়। বিষহরার গানে কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই। যে কেউ বছরের যে কোনো দিন এ গানের ব্যবস্থা করতে পারেন। গৃহস্থের আঙ্গিনায় অথবা বিষহরার থানের সম্মুখে সামিয়ানা টাঙানো হয়। সামিয়ানার নীচে একদিকে আসর বসে, অন্যদিকে খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে 'মেক্ আপ্'-এর ব্যবস্থা করা হয়।

বিষহরার গানে মোখা হল প্রধান বাদ্যযন্ত্র। এর সঙ্গে ঢোলক ব্যবহৃত হয়। মোখার সুর সানাই/সারঙ্গীর তুলনায় তীক্ষ্ণ ও অপেক্ষাকৃত গম্ভীর।

বিষহরার গানে প্রতিরাত্রে একটি থেকে তিনটি পালার ব্যবস্থা করা হয়। পদ্মপুরাণের সমগ্র কাহিনীকে কয়েকটিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। ভাগগুলিকে বলা হয় পালা। যেমন মেন্ডঘর পালা, গোদা-শুদুনী পালা, ডুরাডাসান পালা ইত্যাদি। বিভিন্ন পালার মধ্যে মেন্ডঘর পালাটিই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। কারণ বেহুলার সকরুণ চিত্র উক্তপালায় এত নিখুঁত ভাবে পরিবেশিত হয়, যাতে দর্শক মন সহজেই অভিভূত হয়।

বিষহরার গানে একজন মূল গায়েন থাকেন। এঁকে বলা হয় মূল গীদাল। ইনি প্রথমে দেবী মনসার উদ্দেশ্যে পূর্ব অথবা উত্তর দিকে মুখ করে প্রণাম করেন ও পরে দলের সকলে একত্রে অনুরূপভাবে প্রণাম নিবেদন করেন। প্রণামান্তে কিছুক্ষণ বাদ্যসহযোগে নারীবেশী পুরুষ নর্তকের নৃত্য শুরু হয় এবং অবশেষে ডাসান পালা শুরু হয়।

সুফল লাভের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলের অনেকেই বিষহরা গানের মানসিক করে থাকেন। রোগমুক্তি বা কার্যসিদ্ধি হলেও অনেক সময় উক্তগানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। পালা গান ক্ষেত্রবিশেষে এক, তিন অথবা সাত দিন ধরে চলে। প্রাচীন বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর আগেও বিষহরার গান এতদঞ্চলে একনাগাড়ে পনেরো দিন থেকে একমাস পর্যন্ত চলত।

— মনশিখা —

মনশিখা পর্যায়ের গানগুলিতে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব থাকে। সঙ্গীত যদিও হৃদয়াবেগের প্রকাশ বাহী, তবুও মনশিখা জাতীয় সঙ্গীত দুঃখসুখের, বিরহ মিলনের কথায় মানব হৃদয়কে বিচলিত করে না। মানবজীবনের অধ্যাত্ম সাধনার কথা, দেহের নশ্বরতার কথা জনসমক্ষে প্রচারিত হয় মনশিখা গানের মাধ্যমে। মানব দেহ পঞ্চভূতের মিলনে গঠিত। সংসারী মানুষের কাছে সেই দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহের তুলনায় মন শ্রেষ্ঠ। বিষয়ীমানুষ সেকথা বিস্মৃত হয়। মনশিখা গান সেই বিস্মৃতির

অতল গহ্বর থেকে মানুষকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। মনকে শিক্ষা দানের জন্য 'মনশিক্ষা' এবং তা থেকে 'মনশিখা' গানের সৃষ্টি। বাস্তবজগতে দেহের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু দেহকে মন অপেক্ষা প্রাধান্য দিলে অধ্যাত্ম সাধনা ব্যাহত হবে। এই সাধন তত্ত্বাশ্রয়ী গানগুলি পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলে 'মনশিখা' নামে প্রচলিত। এ গান একক কণ্ঠে গীত হয়।

মনশিখা গানে দোতরা অথবা সারিন্দা নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। চর্মবাদ্য-রূপে খোলের ব্যবহার রয়েছে। প্রাচীন মনশিখা গানে টুঙ্কি বা টেম্‌কি নামক একধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। অধুনা টুঙ্কির ব্যবহার লোপ পেয়েছে।

বাংলার বাউলগান তত্ত্বাশ্রয়ী। বাউলের সুর সীমার সাথে অসীমের যোগসূত্র রচনা করতে চায়। বাউলের মনের পরতে পরতে না পাবার যে গভীর বেদনা তাকেই সে কথা ও সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। মনশিখা গানেও বেদনার কথা আছে, কিন্তু তা বাঙলাগানের মত অতি উগ্র নয়। তবুও একক বেদনাকে এবং দুঃখ তমসার বুক থেকে আহৃত অমৃতকে সাধারণের মাঝে বিলিয়ে দেবার মধ্যে মনশিখা গায়কের কৃত্রিমতা নেই। অকৃত্রিম বলেই বেদনার সামান্য স্পর্শে জীবনের মধুরতম সঙ্গীত মনশিখা গানে ধ্বনিত হয়।

—বিহোর গীত—

বিবাহ উপলক্ষে রাজবংশী কুলনারীদের দ্বারা বিহোর গীত গাইবার প্রচলন অতি প্রাচীন কালের। গানগুলি গুজরাটের মত বরের প্রশস্তায় গাওয়া হয় না। মুখ্যতঃ বিয়েবাড়ীর প্রত্যেককে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করে এই গানগুলি রচিত ও গীত হয়।

'বিহোর গীত' গাইবার উদ্দেশ্যে কিছুদিন আগেই গায়িকা নির্বাচন করে করা হয়। মূল গায়িকার সঙ্গে একাধিক 'মায়ী গীদালি' বা মহিলাগায়িকা উপস্থিত হন। বিবাহের একাধিক অনুষ্ঠান যেমন গায়ে হলুদ, অধিবাস, বরচুমা প্রভৃতি উপলক্ষে অসংখ্য গান মুখে মুখে রচিত হয়েছে। এগুলির কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, কোনো সহযোগী বাদ্যযন্ত্রও এ গানে ব্যবহৃত হয় না। রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহে বিহোর গীত পরিবেশন একটি আবশ্যিক স্ত্রী আচার।

বিহোর গীত এতদঞ্চলে কবে কে প্রথম রচনা করেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেও বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। তবে অধিকাংশ গানই স্ত্রীলোকেরা রচনা করেন ও সুর দেন। 'বিহোর গীত'কে অনেকে বিহোর ছড়া বলে থাকেন। কারণ ছড়ার মত সুর করে এগুলি গাওয়া হয়।

বিহোর গানে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয় তাতে বর, বধূ, পুরোহিত, বরযাত্রী প্রত্যেকেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বস্তুত: তাঁদের অতিষ্ঠ করে তোলার উদ্দেশ্যেই গান ও ছড়াগুলির মধ্যে Satire ও Pun জাতীয় হাস্যরস পরিবেশিত হয়। এই গানগুলিতে Wit এর চমক বা Humour এর নির্মল শুভ্রতা আশা করা বৃথা। বস্তু বা ব্যক্তিকে অত্যন্ত তুচ্ছ পার্থিব পদার্থের সঙ্গে তুলনা করে তাদের দর্শক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। বরকে 'কালা মাসান' কন্যার সুন্দর মুখকে 'নাকড়া মুহা' বা 'বিড়ালমুখী', বরের বাড়ীকে 'শুয়োরের খপ্‌রা, ফুলের মালাকে 'গরুর হাড়া' বা গরুর হাড় বলে অভিহিত করার মধ্যে গায়িকার বিদ্রূপ ভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

বিহোর গানের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই। তবে এগুলির মধ্যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদান পরোক্ষ ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলি তাই সংস্কৃতির বিবর্তন ধারার আলোচনা ও ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য।

— উদাসী, রসিয়া বা পাথারের গান —

জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমাংশে রসিয়া বা অসিয়া নামক এক ধরণের গান প্রচলিত আছে। রসিয়া গানের আর এক নাম উদাসী। এ গান সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্ম সাধনা মুক্ত।

'রস' শব্দের সঙ্গে 'ইয়া' যুক্ত হয়ে 'রসিয়া' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। নয়টি রসের মধ্যে মধুররসের প্রাধান্য রসিয়া গানে পরিলক্ষিত হয়। রসিয়া গান শুধু মাত্র রসের কথা অর্থাৎ যুবক যুবতীর প্রেম ভালবাসার কথায় ভরপুর। প্রেমিক তাঁর প্রেমিকাকে নিবিড়ভাবে পাবার বাসনা জানায় রসিয়া গানে। ভাওয়াইয়া গান প্রেমমূলক হলেও বিরহের বেদনা সেখানে অত্যন্ত প্রবল। রসিয়া গানের গঠনভঙ্গি ভাওয়াইয়া গানের অনুরূপ। এ গানও দোতরা সহযোগে গীত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু অতৃপ্তির সুর ভাওয়াইয়ার মত রসিয়া গানে এত প্রবল নয়। ভাওয়াইয়া গান মনোবিশ্লেষণমূলক বেদনামধুর প্রেম সংগীত। রসিয়া কৌতুক প্রধান প্রেমগীতি। কিন্তু এর সুর ও তাল চট্‌কার মত লঘু ও ক্ষিপ্র নয়। ভাওয়াইয়ার মত দীর্ঘ ও গম্ভীর।

সূর্যাস্তের পর রসিয়া গান বা গীত পরিবেশিত হয়। শরৎকালের শুক্লপক্ষের সন্ধ্যারাত্রে রসিয়া গান নারীমনকে সর্বাপেক্ষা বেশী উদাস করে তোলে। তাই এ গানের আর এক নাম উদাসী। খোলামাঠে, নদীর 'ডাঙ্গায়' বা তীরে, পথের পাশে, গাছের তলায় রসিয়া গান একক কণ্ঠে গীত হয়। বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ক্ষেত্রকে এতদঞ্চলে 'পাথার' বলা হয়। রসিয়া বা উদাসী বেশীর ভাগ সময়েই পাথারে গাওয়া হয়। তাই এ গানের

আর এক নাম পাখারের গান।

****

:: গ্রন্থপঞ্জী ::

১। বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খন্ড) :: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ২৮৩।
২। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি – সুশীলকুমার ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০০।
৩। 'মূল্যায়ন' (৮ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা) ১৩৭১।
৪। ভিক্টোরিয়া কলেজ পত্রিকা – ১৯৬৬। পৃঃ ২৭।
৫। মূল্যায়ন (৮ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭১।
৬। 'চটকে দেওয়া' অর্থ 'অবহেলে সরিয়ে দেওয়া'। উদাহরণ : অয় মোক্ হুত্তি চটকায় দিলে। অর্থাৎ, 'ও আমাকে ওদিকে সরিয়ে দিলে'। উপরোক্ত বাক্যটি রাজবংশী কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

****